International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-II, March 2025, Page No. 219-228
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 78871
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i2.021

নৈতিক অবধারণের সর্বজনীনতা প্রসঙ্গে কান্ট ও হেয়ার: একটি তুলনামূলক আলোচনা

রবিউল সেখ
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received 22.03.2025; Accepted: 29.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

British moral philosopher R. M. Hare and critical German philosopher Immanuel Kant were influential figures in moral philosophy. In this paper, a comparative discussion will be made about the universalizability of their moral concepts. It is clear, however, that both of them gained reputations as moral philosophers in their time. Both have important contributions to the concept of universalizability of moral judgment. But Kant and Hare did not discuss universalizability in the same context. So, comparing two such great philosophers are a very difficult task, yet comparing their philosophical thought will surely be interesting and useful. This paper will attempt to show how Hare's principle of universalizability of moral judgment can be compared with Kant's categorical imperative. It will also be shown that Hare's principle of universalizability of moral judgment is a refinement of Kant's concept of universalizability of moral judgment.

Keyword: *Inversibility, Moral judgment, categorical imperative, Obligation*

ব্রিটিশ নীতি দার্শনিক আর, এম, হেয়ার এবং বিচারবাদী জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট নীতি দর্শনে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই গবেষণাপত্রে তাঁদের নৈতিক অবধারণের সর্বজনীনতা বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। তবে এটা স্পষ্ট যে দুজনেই তাদের সময়ে নৈতিক দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। নৈতিক অবধারণের সর্বজনীনতার ধারণা বিষয়ে দুজনেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু কান্ট ও হেয়ার একই প্রসঙ্গে সর্বজনীনতার আলোচনা করেননি। কাজেই এমন দুই মহান দার্শনিকের তুলনা করা অনেক কঠিন কাজ, তবুও তাদের দার্শনিক চিন্তাধারার তুলনা করা অবশ্যই আকর্ষণীয় এবং উপকারী হবে। এই পত্রে দেখানোর চেষ্টা করা হবে হেয়ারের নৈতিক বিচারের সর্বজনীনতার নীতি কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার সাথে তুলনা করা যায়। এছাড়াও দেখানো হবে হেয়ারের নৈতিক বিচারের সর্বজনীনতার নীতি কান্টের নৈতিক বিচারের সর্বজনীনত্বের ধারণার পরিমার্জিত রূপ।

তবে এই আলোচনা করার আগে কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞা এবং হেয়ারের নৈতিক অবধারণের সর্বজনীনতার নীতি ভালো করে বুঝতে হবে। প্রথমে আমরা কান্টের নীতিদর্শনে নিঃশর্ত অনুজ্ঞার আলোচনা করে নেবো। কান্ট

নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে নৈতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছেন তা উগ্র বিচারবাদ নামে পরিচিত। তাঁর এই বিচারবাদ যে সমস্ত সূত্র গুলির উপর নির্ভর করে আত্মপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা শর্তহীন আদেশ। এই নৈতিক নিয়মটিকে কান্ট তার বিখ্যাত groundwork of the metaphysics of morals নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

কান্ট মনে করেন নৈতিক নিয়ম অভিজ্ঞতা পূর্ব ও স্বতঃসিদ্ধ, তা কখনোই অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। তাই তিনি বলেন কোনও কাজ যদি নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ করে করা হয় তাহলে ভালো, নতুবা তা মন্দ বলে বিবেচিত হবে। কান্টের বিচারবাদ বা কৃচ্ছতাবাদ যে তিনটি মৌলিক ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধারণাটি হল নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা শর্তহীন আদেশ। কাজেই প্রশ্ন হল নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা শর্তহীন আদেশ কি? এ প্রসঙ্গে কান্ট বলেন-" বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কর্মপ্রয়াসের ইচ্ছা যখন বাধ্যতামূলকভাবে বিবেক কর্তৃক নির্দেশিত হয় এবং তার কোন অন্যথা হয় না, তখন তাকে বলে শর্তহীন আদেশ বা অনুজ্ঞা"।[1] সুতরাং আমাদের বিবেক যে নৈতিক নিয়মকে আমাদের সামনে হাজির করে তাই শর্তহীন আদেশ। নৈতিক নিয়মে বিবেকের আদেশ বা নির্দেশ কোন সাধারণ উক্তি নয়। 'তুমি কাজটি করতে পার' এবং 'তোমাকে কাজটি করতেই হবে' এই দুই ধরনের উক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। কারণ, প্রথমটি হল বক্তার সাধারণ উক্তি যা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দ্বিতীয়টি হল বক্তার আদেশ বা অনুজ্ঞা যা আমাদেরকে করতেই হবে। এখানে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন ভূমিকাই নেই। নৈতিক নিয়মও আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না বলে তা শর্তহীন আদেশ রূপে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে নীতিবিজ্ঞানী লিলি তাঁর 'An Introduction to Ethics' গ্রন্থে বলেছেন-" Kant's term 'Categorical imperative implies that the Moral Law is a Command made by somebody"[2].

নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ কোন বিশেষ বা সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পালন করা হয় না। এগুলি 'অবশ্যই শর্তহীনভাবে পালনীয়। কান্টের মতে, "প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির যে নিয়ম আমাদের ইচ্ছাকে আদেশ করে সেটি হল সেই নিয়ম যা আমাদের কর্তব্যকে প্রকাশ করে"[3] । নৈতিক নিয়মকে আমরা যে পালন করতে বাধ্য হই তার মূল কারণ হল যে, আমরা এগুলিকে আমাদের কর্তব্য বলে স্বীকার করে নিই। এক্ষেত্রে কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এগুলিকে মান্য করি না। অর্থাৎ নৈতিক নিয়ম যে শর্তহীন এ সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

কান্ট নৈতিক নিয়মকে আদেশ বা অনুজ্ঞা রূপে অভিহিত করেছেন। কান্ট "নৈতিক নিয়মকে এক 'নিঃশর্ত অনুজ্ঞা' (Categorical Imperative) বলেছেন, যা আমাদের ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি বা প্রজ্ঞা (Practical reason) থেকে অর্থাৎ বিবেক থেকে নির্গত হয়। আমাদের অন্তর থেকে নির্গত হয় বলে নিয়মটিকে আমরা সরাসরি জানতে পারি অর্থাৎ নিয়মটি আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতিলব্ধ (intuitive)"[4]। এই আদেশ বা অনুজ্ঞা হল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তথা বিবেকের আদেশ- যা নিম্নবৃত্তি তথা মানুষের জৈববৃত্তির উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ, পক্ষান্তরে মানুষের উপর মানুষেরই আদেশ, বাইরে থেকে চাপানো কোন আদেশ নয়। নৈতিক নিয়মের মধ্যে তাই এক ধরনের আন্তর বাধ্যবাধকতা বোধ বিদ্যমান। এর অর্থ হল- নৈতিক নিয়ম হল মানুষেরই বুদ্ধির নিয়ম এবং মানুষ তা মানতে বাধ্য। মানুষ নৈতিক নিয়ম মানতে বাধ্য একারণেই যে, তার এই নৈতিক নিয়ম মানার ক্ষমতা আছে। এই প্রসঙ্গে তাই কান্ট

---

[1] Kant, Immanuel, Groundwork of the Metaphysic of Morals, sec. I, first chapter, পৃ– ৩০-৪০

[2]W. Lillie: An Introduction to Ethics: পৃ-১৫৮

[3] মুহিত, মোঃ আব্দুল, ইমানুয়েল কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিদর্শন, পৃ - ১২৯

[4] ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র, সাম্মানিক নীতিবিদ্যা, পৃ- ২২২

বলেন-"what we ought to do, we can do"[5] এর সরল অর্থটিকে এভাবেও উপস্থাপিত করা যায় যে, মানুষ যে নৈতিক নিয়ম পালন করে, তা সে মানতে পারে না-এমন কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা হল- 'ঔচিত্য' শব্দটি তার সমস্তরকম মাধুর্য, তাৎপর্য, প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণকে হারিয়ে ফেলে যদি তার মধ্যে সামর্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকে। কান্টের মতে, নৈতিক নিয়ম হল এমনই এক ধরনের নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ যা মনুষ্যজাতির সমস্ত অন্তর্ভুক্ত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমস্ত মানুষই এরূপ অনুজ্ঞা বা আদেশ পালনে বাধ্য। এর কোন প্রকার ব্যতিক্রম লক্ষণীয় নয়, প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিয়ম পালনে আবশ্যিকভাবে বাধ্য। কান্টের নৈতিক নিয়মকে ম্যাকেঞ্জি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, "What we sought to do we ought to do. There can be on higher level which the moral imperative might be set aside".[6]

কান্ট তাঁর Metaphysic of Morals গ্রন্থে নিঃশর্ত অনুজ্ঞার আদেশটিকে তিনটি আকারের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। নিঃশর্ত অনুজ্ঞার এই তিনটি আকার হল:

প্রথমত, (Treat every rational being including yourself always as end, and never as a means.[7])। কান্ট মনে করেন যে, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই অন্তরীণ হল "মনুষ্যত্ব"। সে কারণেই প্রত্যেকটি মানুষেরই উচিত হল নিজেকে নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করা, এবং সেই সঙ্গে অপর সকলের মনুষ্যত্বকেও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (end) রূপে প্রকাশ করা। নিজের বা অপর সকলের মনুষ্যত্বকে কখনোই উপায় (means) রূপে ব্যবহার করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, (Act as a member of the kingdom of ends.[8])। কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার এই আকারটি প্রথম আকারটি থেকেই নিঃসৃত। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই যদি নিজেকে নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করে, তাহলে ক্রমান্বয়ে গঠিত হয় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সাম্রাজ্য । এরূপ সম্মিলিত উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যই মানুষকে সৎ এবং সুখী জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে বাধ্য করে। এভাবেই ব্যক্তি নিজের এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থ হয়।

তৃতীয়ত, "(Principle of Moral conduct is morally binding on me if and only if I can regard it as a law which I impose upon myself.[9])"। কান্টের অভিমত হল যে, নিঃশর্তে অনুজ্ঞার নিয়মটি কখনোই কামনা বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। এ হল মানুষের সদিচ্ছা থেকে নিঃশর্ত অন্তরের ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রকাশ। এ নিয়ম কখনোই বাহ্যশক্তির দ্বারা বলপূর্বক আরোপিত নয়। নিয়মটি অবশ্যই স্বতঃআরোপিত এবং বাধ্যতামূলক ।

এবার আমরা হেয়ারের সর্বজনীনতা বিষয়ে অগ্রসর হব। তবে সর্বজনীনতার মতবাদ আলোচনার পূর্বে ব্যবস্থাবাদ ও নির্দেশমূলক তত্ত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় ব্যবস্থাবাদ (Prescriptivism) এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যার প্রধান প্রবক্তা হলেন আর. এম. হেয়ার। যদিও তিনি স্টিভেনসনের আবেগবাদের আদেশসূচক বৈশিষ্টের সূত্র ধরেই ব্যবস্থাবাদের (Prescriptivism) প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তাঁর নৈতিক মতবাদ আবেগবাদের সংশোধিত রূপ বলে মনে হলেও সম্পূর্ণরূপে আবেগবাদ থেকে ভিন্ন। তবে তিনি কিছু ক্ষেত্রে আবেগবাদী মতবাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। যেমন আবেগবাদীরা যখন প্রকৃতিবাদ ও অ-প্রকৃতিবাদের

---

[5] Kant, Immanuel, Groundwork of the Metaphysic of Morals, sec. I, first chapter, পৃ- ৩০-৪০

[6] Mackenzie, J. S, A manual of ethics, পৃ- ১৩৮

[7] Kant, Immanuel Groundwork Metaphysic of Morals, Sec. II, পৃ- ৪৬

[8] Kant, Immanuel Groundwork Metaphysic of Morals, Sec. II, পৃ-৪০- ৪৬

[9] তদেব, sec. II, পৃ- ৩৪-৪০

সমালোচনা করে বলেন নৈতিক অবধারণ কোন বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করে না তখন তিনি তাদের সাথে সহমত পোষণ করেন। আর আবেগবাদীগণ যখন অ-প্রকৃতিবাদকে বর্জন করে বলেন যে নৈতিক আলোচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিষয় সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রবণতা বা মনোভাবের প্রকাশ তথা বক্তা বা শ্রোতার মধ্যে এক ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করা তখন তিনি এই মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। হেয়ারের মতে, "নৈতিক আলোচনার প্রধান কাজ হচ্ছে ব্যক্তির প্রবণতাকে প্রভাবিত করা নয়; বরং তার কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া"।[10] উদাহরণস্বরূপ একজন মা যখন তার সন্তানকে বলেন যে তোমার মনোযোগী হওয়া উচিত; তখন তিনি সন্তানের আচরণের কোন বর্ণনা দিচ্ছেন না, কোন কিছু করার জন্য তার প্রবণতার ওপর প্রভাবও বিস্তার করছেন না। সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে এক ধরনের নির্দেশ দিচ্ছেন। কাজেই হেয়ারকে অনুসরণ করে বলা যায় নৈতিকতার মূল বিষয় হচ্ছে কোন কিছু করা বা না করার পক্ষে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করা নয়; বরং কোন কিছু করার জন্য কাউকে নির্দেশ দেওয়া। কোন কিছু করার জন্য কাউকে নির্দেশ দেওয়া এবং কোন কিছু করার পক্ষে কাউকে প্রভাবিত করা ঠিক নয়। কোনও কিছু করার জন্য কারও অনুভূতির উপর প্রভাব সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে তাকে কোন কিছু করতে প্রভাবিত করা। কাজেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফলদায়ক হলেও শ্রোতাকে বক্তার উক্তি যুক্তিসম্মত উপায় ব্যতিরেকেই কাজটি করতে হয়। কিন্তু নৈতিক অনুজ্ঞা বা আদেশের ক্ষেত্রে শ্রোতা বক্তার বক্তব্যকে যুক্তিসম্মত উপায়ে যাচাইকরণের মাধ্যমেই কাজটি করে থাকেন। কাজেই হেয়ার বলেছেন "নৈতিক উক্তির অর্থ কোন ক্রমেই আবেগমূলক নয়; বরং নির্দেশমূলক"।[11] তাই তিনি মনে করেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন নৈতিক ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ বা উদঘাটন করা। তাই তিনি আবেগবাদকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন-

প্রথমত, আবেগবাদ কাজের যৌক্তিকতা এবং কাজের কারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়ে ফেলেছে।

দ্বিতীয়ত, ভাষার মূল শক্তির সাথে এর মূল অর্থের সামঞ্জস্যতা সাধনে এই মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয়ত, হেয়ার স্টিভেনসনের যুক্তিসঙ্গতহীন মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে ব্যক্তির উপর আবেগ বা প্রবণতার প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিতে পারেননি। স্টিভেনসনের মতে, নৈতিক যুক্তির মূল লক্ষ্য হল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির প্রবণতা পরিবর্তন ঘটানো। তবে, এই অ-যৌক্তিক পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রবণতা পরিবর্তনে সহায়ক হলেও হেয়ার মনে করেন যে এ পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গতভাবে সমর্থন করা যায় না। তাই তিনি বলেন, নৈতিক সমস্যা যুক্তিসংগতভাবেই নৈতিক ভাষায় প্রকাশ পায়। নৈতিক আলোচনায় প্রতিপক্ষকে যুক্তিসঙ্গতভাবে জব্দ বা পরাজিত করার অভিনব উপায় হচ্ছে তার বক্তব্যের পেছনে যে যুক্তি রয়েছে তাকে অকেজ প্রমাণ করা। কাজেই তিনি বলেন যে নৈতিক যুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য হল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে যে যুক্তি বা কারণ প্রদর্শন করা হয় তা সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হবে।

চতুর্থত, স্টিভেনসনের আবেগবাদ অর্থ বিষয়ক কোন সর্বজনীন মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ষ্টিভেনসনের মতে, নৈতিক বচন বক্তা বা শ্রোতার মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত, এ মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার কোন সর্বজন স্বীকৃত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না; শুধু ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতির মধ্যেই সীমিত। নৈতিক ভাষার অর্থ যদি সবার কাছে একইভাবে গ্রহণযোগ্য না হয়ে শুধু ব্যক্তি বিশেষের আবেগ-অনুভূতির বিষয়বস্তু হয়, সে ক্ষেত্রে নৈতিক বাক্যের সর্বজনীনকরণ যোগ্যতার বিষয়টি চাপা পড়ে থাকবে এবং অর্থহীন হয়ে পড়বে। হেয়ারের মতে, নৈতিক বচন বা ভাষার অর্থ প্রচলিত নীতি বা নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্যক্তি বিশেষের আবেগ-অনুভূতির মাধ্যমে নৈতিক ভাষার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কাজেই হেয়ার মনে করেন যে আবেগবাদীরা নৈতিক ভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাধারণ বোধগম্যতার পক্ষে এক অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আবেগবাদী চিন্তাবিদদেরকে এই বলে অভিযুক্ত করেন যে তাঁরা নৈতিক ভাষার প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর স্বাভাবিক অর্থের সাথে তাল-গোল পাকিয়ে ফেলেছেন।

[10] আব্দুল হামিদ, ড. এম,(২০১০), সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা, পৃ-১৩১

[11] আব্দুল হামিদ, ড. এম, (২০১০), সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা, পৃ-১৩২

আবেগবাদের উল্লেখিত বিভিন্ন ত্রুটিসমূহের আলোচনার পর হেয়ার তাঁর মতবাদের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা দেন। উল্লেখ্য, হেয়ারের মতবাদের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যত্রয় হচ্ছে (১) নৈতিক বাক্য বা উক্তি এক ধরনের নির্দেশমূলক অবধারণ এবং প্রত্যেক নৈতিক পদ বা বচনের বর্ণনাতিরিক্ত ("Supervenience")[12] বৈশিষ্ট্য রয়েছে, (২) নির্দেশমূলক অবধারণ অন্যান্য প্রকারের নৈতিক অবধারণ থেকে সর্বজনীনতার জন্য ভিন্ন প্রকৃতির("Moral judgement are a kind of prescriptive judgements…and they are distinguished from other judgements of this class by being universalizable"[13] এবং (৩) নৈতিক অবধারণে যৌক্তিক পদ্ধতির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, বুদ্ধিসম্মত উপায়ে নৈতিক যুক্তির অর্থ বুঝাতে হবে।

তাঁর মতে, 'প্রত্যেক নৈতিক উক্তি বা বচন এক ধরনের নির্দেশমূলক অবধারণ("The Language of morals is one short of prescriptive language")[14]। অন্যথায়, প্রত্যেক নৈতিক অবধারণে একটি নির্দেশমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই নির্দেশমূলক বৈশিষ্ট্যটি নৈতিক অবধারণের সরলতম রূপ। নৈতিক অবধারণ তাই আদেশসূচক বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'তোমার দেনা পরিশোধ করা উচিত' উল্লিখিত নৈতিক অবধারণে এইরূপ নির্দেশের কথা ব্যক্ত হয়েছে যে, 'দেনা পরিশোধ কর'। নৈতিক অবধারণে বিরাজমান এই আদেশসূচক দিকটিকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে 'দেনা পরিশোধ কর না'। হেয়ারের মতে, নৈতিক অবধারণের নিদের্শমূলক বৈশিষ্ট্যের অর্থ হচ্ছে: কোন কাজকে সম্পাদন করা উচিত বলে স্বীকার করার সঙ্গে যৌক্তিকভাবে কাজটি সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া। কাজেই কোন কাজ সম্পাদন করা উচিত বলে মনে করার অর্থই হচ্ছে বক্তা নৈতিক কর্তাকে তার কর্তব্যকে সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ বা আদেশ দিচ্ছেন। অন্যথায়, নৈতিক অবধারণ হচ্ছে মূলত ক্রিয়া-নিদের্শক বা নির্দেশমূলক।

বলা যায় নৈতিক ভাষা বা বচনের নির্দেশমূলক দিকটি ব্যাখ্যার জন্য তিনি এক অভিনব প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেন। এ অভিনব প্রক্রিয়াটি বর্ণনামূলক বলে মনে হলেও তিনি একে নৈতিক অবধারণের বর্ণনাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই তিনি মনে করেন যে প্রত্যেক নৈতিক অবধারণের মূল্যায়নমূলক পদসমূহের (যেমন 'ভাল', 'যথোচিত', ঔচিত্য) এক ধরনের বর্ণনাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নৈতিক ভাষায় ব্যবহৃত এ সকল মূল্যায়নমূলক শব্দসমূহের অর্থের বিশ্লেষণ করেই তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে আসেন। তাঁর মতে, যখন আমরা কোন মূল্যায়নমূলক অবধারণ প্রকাশ করি তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে আমরা অবধারণের সমর্থনে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করি। কিছু নৈতিক অবধারণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'এই একটি ভাল নাটক' বা 'তোমার শিক্ষকের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।' প্রত্যেকটি অবধারণের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে: কেন নাটকটি ভাল? বা কেন তোমার শিক্ষকের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেকটা প্রকৃতিবাদী বর্ণনার মত হবে, যেমন- এই নাটকটি ব্যয়বহুল বা বিনোদনমূলক অথবা, তোমার শিক্ষক তোমার পড়াশোনায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে ইত্যাদি। তাঁর মতে, ঠিক একইভাবে 'ভালত্ব' বা 'ঔচিত্য' পদসমূহের যৌক্তিকতা ও বিচারাধীন বস্তু বা কাজের অ-মূল্যায়নমূলক বা বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যর ওপরই নির্ভরশীল। তিনি মনে করেন যে নৈতিক অবধারণের এই অ-মূল্যায়নমূলক দিকটিই মূল্যায়নমূলক শব্দের বর্ণনাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। তবে, তিনি নৈতিক পদের অ-মূল্যায়নমূলক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যার জন্য নৈতিক প্রকৃতিবাদী বা স্বজ্ঞাবাদী পন্থা অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, নৈতিক অবধারণে মূল্যায়নমূলক শব্দগুলি কি নির্দেশ করে, তা বড় প্রশ্ন নয়; বরং এগুলো কি কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেটাই বড় কথা। অন্যকথায় নৈতিক ভাষা কোন তথ্য বা বাস্তব অবস্থার নির্দেশ দেয় না; বরং 'আমি কি করব?' বা 'আমাদের কি

[12] Hare, R.M, The Language of Morals, পৃ-৮০
[13] Hare, R.M, Freedom and Reason, পৃ-৪
[14] Hare, R.M, The Language of Morals, পৃ-১

করা উচিত?' তার নির্দেশ করে। নৈতিক পদের এ নির্দেশমূলক দিকটি অ-মূল্যায়নমূলক বৈশিষ্ট্য বা বর্ণনাতিরিক্ত ধারণার ওপর নির্ভরশীল। মূল্যায়নমূলক শব্দসমূহ মূলত পরামর্শ, উপদেশ বা পছন্দ- অপছন্দ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মোটকথা, এগুলোর ব্যবহার প্রধানত নির্দেশসূচক। অর্থাৎ নৈতিক অবধারণ আদেশসূচক বাক্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হেয়ারের ব্যবস্থাবাদ বা নির্দেশবাদ ধারণাটি আরও ভালো করে বুঝতে হলে নিম্নোক্ত আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের বিচার-বিশ্লেষণের দরকার। প্রত্যেকে নৈতিক অবধারণের একটি আদেশসূচক বৈশিষ্ট্য আছে । প্রশ্ন হতে পারে: মূল্যায়নমূলক অবধারণের এরূপ বর্ণনা কি স্বেচ্ছাচারিতামূলক নয়? তিনি দাবি করে বলেন যে, এ সংজ্ঞাটি সাধারণ ব্যবহার বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, মূল্যায়নমূলক অবধারণসমূহ আমাদের পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমাদেরকে কি পছন্দ করতে হবে বা হবে না, তার নির্দেশ দেয়। আমরা যখন ভাল-মন্দ কিংবা যথৌচিত্য-ঐচিত্য সম্পর্কে বাদানুবাদে অবতীর্ণ হই, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্তের সমর্থনে কতগুলো যুক্তির উপস্থাপন করি। ফলে, ব্যক্তি কি করবে বা করবে না তার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট ইঙ্গিত বা নির্দেশটি যৌক্তিকতায় প্রকাশ পাই। কাজেই, নৈতিক অবধারণের আদেশসূচক দিকটি কোন অবস্থাতেই স্বেচ্ছাচারিতার ফলশ্রুতি নয়।

আবার নৈতিক অবধারণসমূহ কি শুধু আদেশসূচক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনের অন্য কোন অর্থ আছে? তিনি এ প্রসঙ্গে তিন রকমের অর্থের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি কোনও বচনের বর্ণনাত্মক অর্থ থাকে, আমরা তখন একে বর্ণনাত্মক পদ, শব্দ বা প্রকাশ বলব; যদি নির্দেশমূলক অর্থ থাকে তখন আমরা একে নির্দেশসূচক পদ বলব; আর যদি এর দু'রকমের অর্থই থাকে, তখন আমরা একে মূল্যায়নমূলক পদ বলব। কাজেই নৈতিক অবধারণের আদশসূচক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এর একটি বর্ণনামূলক অর্থ রয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে নৈতিক অবধারণের বর্ণনামূলক অর্থটি কি? যখন আমরা কোন বস্তুকে ভালো বা মন্দ বলি তখন ঐ বস্তু বা ঘটনার গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোই নৈতিক অবধারণের বর্ণনামূলক অর্থ। নৈতিক শব্দের বর্ণনামূলক অর্থ ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তনশীল; কেননা, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন গুণের জন্য আমরা ভালো বলে থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সুমিত ভালো মানুষ' 'এটি একটি ভাল পেন' প্রভৃতি অবধারণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনামূলক অর্থ রয়েছে। কেননা, এখানে মানুষ বা পেন এর ভালত্ব-নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে 'ভাল' পদটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়ম বা নীতিসমূহকেই তিনি 'ভালত্ব' নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যসমূহ বলে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ্য, এই ভালত্ব নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যসমূহই মূলত 'ভাল' পদটির বর্ণনামূলক অর্থ।

আরও প্রশ্ন হতে পারে: নৈতিক পদসমূহের বর্ণনামূলক অর্থের সাথে নৈতিক পদের মূল্যায়নমূলক অর্থের কি কোন সম্বন্ধ আছে? প্রসঙ্গতঃ নৈতিক পদের আদেশসূচক বৈশিষ্ট্যের প্রধানত মূল্যায়নমূলক অর্থ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অতএব, নৈতিক পদের মূল্যায়নমূলক ও বর্ণনামূলক উভয় অর্থ থাকলেও প্রথমোক্ত অর্থটিই অবধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বলে মনে করেন। নৈতিক অবধারণে বর্ণনামূলক অর্থের ভূমিকা গৌণ । 'ভাল' নৈতিক পদটির আদেশসূচক বৈশিষ্ট্যটি যেমন 'এটি করা উচিত' বা 'এটি পছন্দ করা উচিত' প্রভৃতি অনুজ্ঞার বর্ণনা করে, ঠিক তেমনি এ দ্বারা আমরা কোন কিছুকে প্রশংসা বা কোন কিছুর মূল্যায়নকে বুঝে থাকি। কাজেই, 'ভাল' নৈতিক পদের আদেশসূচক বৈশিষ্ট্যটির মূল্যায়নমূলক অর্থটিই মুখ্য; বর্ণানাত্মক অর্থটি গৌণ।

কাজেই হেয়ারের ব্যবস্থাবাদে সকল নৈতিক পদের আদেশসূচক বৈশিষ্ট্যটি একই রকম নয়। আদের্শসূচক অর্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে নৈতিক পদসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত: (i) অনুজ্ঞাসূচক নৈতিক পদ (ii) মূল্যায়নমূলক পদ । 'ঔচিত্য', 'যথার্থ', 'কর্তব্য' প্রভৃতি পদসমূহ প্রধানত অনুজ্ঞাসূচক এবং 'ভাল' বা 'কামনাযোগ্য' প্রভৃতি পদসমূহ মূলত মূল্যায়নমূলক। এই দু'শ্রেণীর নৈতিক পদের মধ্যে অনুজ্ঞাসূচক পদসমূহ অধিকতর মৌল। কেননা, ঔচিত্যমূলক অবাধারণসমূহ সরাসরি আদেশ বা নির্দেশের সাথে যুক্ত; অথচ 'ভাল' পদটির দ্বারা মূলত কোন কিছুর

প্রশংসা বা মূল্যায়ন করাকে বোঝায়। কোন কিছুকে 'ভাল' বলার অর্থ হচ্ছে আমরা তা পছন্দ বা প্রশংসা করি। অথচ এটি করা উচিত বলার অর্থ হচ্ছে আমরা কাজটি করার জন্য নির্দেশ বা উপদেশ দিচ্ছি।

আবারও হেয়ারের ব্যবস্থাবাদী মতবাদ কি সব মূল্যায়নমূলক শব্দের বেলায় প্রযোজ্য? আগের আলোচনায় বলা হয়েছে যে মূল্যায়নমূলক শব্দের অর্থের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। তবুও, সকল নৈতিক পদের অনুজ্ঞাসূচক বৈশিষ্ট্য একই রকমের নয়। যেমন- 'যথৌচিত্য' বা 'ঔচিত্য' শব্দের অর্থ ভাল পদটির অর্থের চেয়ে ভিন্নতর। এইজন্য একটি 'যথোচিত' কাজ সর্বদা ভালো নাও হতে পারে। একটি যথোচিত কাজ বিশেষ স্বীকৃত নৈতিক নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হলেও ভালো কাজটি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে সম্পাদিত হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, যথোচিত কাজটি কি ভালো বলে বিবেচিত হবে? উদাহরণস্বরূপ একজন বিচারক হত্যার দায়ে কোন এক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন; কাজটি নিঃসন্দেহে যথোচিত বলে বিবেচিত কিন্তু, প্রতিবেশীসুলভ মনোমালিন্যের কারণে বিচারক যদি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন, তাহলে কাজটি অবশ্য ভাল বলে বিবেচিত হবে না। আবার, একটি ভালো কাজ যথোচিত নাও হতে পারে। দয়ার বশবর্তী হয়ে কোন গরিব লোককে সাহায্য করা ভালো। কিন্তু একই কাজ যদি গরিব লোকটির শেষ সম্বল, অর্থাৎ, তার পৈতৃক ভিটা-বাড়ি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা হয়, তাহলে কাজটি ভালো বা যথোচিত কোনটিই নয়। বিশেষত, হেয়ারের নীতি দর্শন বলতে গেলে, ঔচিত্যমূলক অবধারণের বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত।

এখানে আরও বলা দরকার যে ঔচিত্যের ধারণা উপরোক্ত 'যথৌচিত্য' বা 'ভাল' এর ধারণা থেকে একটু ভিন্নতর। কাজেই এই কারণে এখন প্রশ্ন হতে পারে হেয়ারের ঔচিত্যমূলক সিদ্ধান্তসমূহ সমভাবে 'যথৌচিত' বা 'ভাল' সম্পর্কীয় মূল্যায়নমূলক অবধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা? হেয়ার তাঁর 'দি ল্যাংগুয়েজ অব মরালস' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বলেন যে "ঔচিত্যমূলক সিদ্ধান্তসমূহ 'ভাল' বা 'যথোচিত' শব্দসমূহ এর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে, যদি 'ভাল' বা 'যথোচিত' শব্দসমূহ ঔচিত্যমূলক অবধারণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে। ভালো শব্দটিকে যদি আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করি যে' 'এটি ভাল' মানে আমাদের এ কাজটি করা উচিত; তাহলে, নৈতিক পদের অনুজ্ঞাসূচক বৈশিষ্ট্যটি 'ভাল' শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তেমনি যথৌচিত্য শব্দটিকে যদি এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে 'যথোচিত' মানে 'এরূপ করা সঠিক হবে' তাহলেও নৈতিক পদের আদেশসূচক বৈশিষ্ট্যটি 'যথোচিত' পদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং হেয়ারের ব্যবস্থাবাদ 'ভাল', 'যথোচিত্য' ও 'ঔচিত্য' প্রভৃতি নৈতিক পদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য"[15]।

হেয়ারের নির্দেশবাদী নৈতিক মতবাদের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হল। তবে, তাঁর মতে, "নৈতিক পদ বা অবধারণের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়াও এর আর একটি বিশেষ দিক আছে। হেয়ার নৈতিক পদের এ বৈশিষ্ট্যটিকে সর্বজনীনকরণযোগ্যতা বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং নৈতিক পদ শুধু নির্দেশসূচক নয়, সার্বজনীনও বটে"।[16]

'সর্বজনীনকরণ' যোগ্যতা কথাটি হেয়ার সর্বপ্রথম কোন এক প্রবন্ধে নৈতিক বিচার প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন। প্রশ্ন হল: নৈতিক বিচারের সর্বজনীনকরণযোগ্যতা বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? এই প্রসঙ্গে বলা যায় সর্বজনীনকরণযোগ্যতা বলতে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত কোন নৈতিক নীতি বা বিধিকে তিনি বোঝেননি। সর্বজনীনকরণযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল: নৈতিক বিচার মাত্রই এমন হবে যে বিচারক বা কর্তা সেটিকে সর্বজনীনকরণযোগ্য, অর্থাৎ একই নৈতিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অবস্থানকারী সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করবেন। অতএব, সর্বজনীনকরণযোগ্য বলতে একই নৈতিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অবস্থানকারী সমস্ত ব্যক্তির

[15] আবদুল হামিদ, ডঃ এম, সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা , পৃ -১৩৬

[16] Hare, R.M, Freedom and Reason, পৃ-৪

ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য কোন নৈতিক নিয়ম বা বিধির কথাই হেয়ার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি কোন একটি নৈতিক ক্রিয়া A'-এর জন্য করণীয় হয়, তাহলে, অনুরূপ ক্ষেত্রে ঐ বা অনুরূপ নৈতিক কর্ম 'B'-এর জন্য অবশ্য করণীয় হবে।

'সর্বজনীনত্ব' যেকোনও নৈতিক বিচারের একটি অপরিহার্য গুণ। নৈতিক নিয়মের সর্বজনীনকরণযোগ্যতা না থাকলে নৈতিক অবধারণের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে তিনি সর্বজনীনকরণযোগ্য নীতি দ্বারা নৈতিক অবধারণকে তথ্য বিষয়ক বা বর্ণনামূলক অবধারণের মত যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেবার প্রয়াস চালান এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বজনীনত্ব যে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে অপিরিহার্য, তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। তাঁর যুক্তির অন্যতম লক্ষ্য হল নৈতিক অবধারণ সম্পর্কে আবগবাদী ধারণার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা। আবেগবাদী মতবাদ অনুসারে, নৈতিক পদ বা অবধারণ ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ মাত্র। অতএব, নৈতিক বিচারের সত্য-মিথ্যা বা বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্নটি অবান্তর। নৈতিক বিচার ব্যক্তির অনুভূতি বা প্রবণতার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি যাই হোক না কেন, নৈতিক অবধারণের যৌক্তিক গুণাবলী ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কাজেই আবেগবাদী মতবাদের বিষয়ীগত ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করে তিনি নৈতিক অবধারণের যৌক্তিক দিকটির প্রতি খেয়াল রেখেই হেয়ার সর্বজনীনকরণযোগ্যতার নীতি প্রচার করেছেন।

হেয়ার তাঁর The Language of Morals ' গ্রন্থে আরও বলেন যে একই ব্যক্তি একই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করতে পারেন। যেমন পিতা হিসেবে সন্তানদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা ও সহনশীলতার নীতি এবং একজন প্রসাশক হিসেবে কর্মস্থলে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার নীতি একই সাথে কেউ পালন করতে পারেন। তাতে নৈতিক নিয়মের সর্বজনীনত্বের নীতির লঙ্ঘন করা হয় না। শুধু যা দরকার তা হচ্ছে অনুসৃত নীতি সম্পর্কে অনুরূপ পরিস্থিতিতে একটু দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়া। অর্থাৎ কর্মস্থলে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার নীতি যদি কেউ অবলম্বন করে থাকেন, তবে সর্বক্ষেত্রেই তা সমানভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত। কর্মস্থলে কোন কোন ক্ষেত্রে শৈথিল্য বা পক্ষপাতিত্বের নীতি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি নৈতিক বিচার বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোন স্বীকৃতি নৈতিক নিয়ম বা আদর্শের পরিবর্তে ব্যতিক্রম হিসেবে যদি অন্য কোন স্বীকৃত নৈতিক নিয়ম বা আদর্শের অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়, তবে তাও সর্বজনীনকরণযোগ্যতার নীতির ভিত্তিতে করতে হবে। অর্থাৎ একটি নীতির প্রতি আস্থাশীল থাকাকালীন আমি সেই নীতির কোন ব্যতিক্রম বিশেষ কারো জন্য করতে পারি না, যদি আমি এ ব্যতিক্রমটি অনুরূপ ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমর্থন না করি। ধরে নেওয়া যাক, মহাবিদ্যালয়ে সম্মান কোর্সে ভর্তির জন্য কমপক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫০ শতাংশের প্রয়োজন। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তির ছেলে বা প্রিয়জনের কথা মনে রেখে ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন কোনও এক বছরের জন্য খানিকটা পরিবর্তন বা শিথিল করলেন, অর্থাৎ ভর্তির জন্য দরখাস্ত করার সর্বনিম্ন যোগ্যতা ৫০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ নির্ধারণ করা হলো। নৈতিক নিয়মের সর্বজনীনকরণযোগ্যতা নীতি দাবি করে যে মহাবিদ্যালয়ে সম্মান কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনে এ পরিবর্তনটি অন্যান্য বছরের জন্যও সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নতুবা, কোন এক বিশেষ ব্যক্তির কথা সামনে রেখে শুধু এক বিশেষ বছরের সম্মান কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত বিধি-কানুনের পরিবর্তিত নিয়মটি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। হেয়ারের সর্বজনীনকরণযোগ্যতার নীতি অনুসারে কোন নৈতিক নিয়ম বা ঐ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নিয়ম অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে হেয়ারের নৈতিক বিচারের সর্বজনীনকরণযোগ্যতার নীতি কান্টের শর্তহীন আদেশের একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের সাথে তুলনা করা যায়। কান্ট যেখানে বলেন: এমন নীতি অনুসারে কাজ কর যাতে একই সময়ে একটি সর্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে তুমি ইচ্ছা করতে পার। অর্থাৎ কান্টের মতে, কাজটি এমন নৈতিক নিয়ম অনুসারে করতে হবে যা সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করা যায়। তাঁর মতে,

কর্তব্য আমাদের সকলের জন্য এক ও অভিন্ন। আমাদের এমন কাজ করতে হবে যা সকলের করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, কান্ট নৈতিক বিচার বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দুটি গুণকে আবশ্যকীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। নৈতিক নিয়মের সর্বজনীনত্ব এবং বাধ্যবাধকতাবোধ । কান্ট একটি উদাহরণের সাহায্যে তাঁর ধারণা পরিষ্কার করতে সচেষ্ট হন। তিনি বলেন যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা একটি 'অনুচিত' কাজ। সকলেই যেকোন সময় তা ভঙ্গ করতে পারে- এমন অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর মতে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অন্যায়; কেননা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ব্যাপার সঠিক হতে পারে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ব্যাপার সঠিক হলে প্রতিজ্ঞা বলে কোন কিছুই থাকে না। এ ধরনের কাজকে সার্বজনীনরূপে গণ্য করা যায় না। যে কাজ সার্বজনীন নয়, সে কাজটি অসংগতিপূর্ণ। যে কাজে কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হবে না শুধু এমন কাজটিই করা আমাদের কর্তব্য। কাজেই কান্ট এরূপ সিদ্ধান্ত নেন যে সার্বজনীনত্ব এবং বাধ্যবাধকতাবোধ নৈতিক বিচারের দুটি অপরিহার্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

কান্টের মতে নৈতিক সিদ্ধান্ত স্বভাবতই কোন নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে নীতিটিই হল সর্বজনীনত্বের কারণ। নৈতিক মান নিরূপণের ক্ষেত্রে কাজটির প্রকৃত ফলাফল বিচার অনাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে, একমাত্র বিবেচ্য বিষয় কাজটি কোন নীতি অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা জানা এবং সেই নীতিটি সর্বজনীন কিনা। কান্টের নৈতিক বিচারের দ্বিতীয় অপরিহার্য গুণ হচ্ছে বাধ্যবাধকতা। তাঁর মতে, বাধ্যবাধকতাবোধ সর্বজনীনত্বের ধারণার আনুষঙ্গিক। কোন কিছু সম্পর্কে আমার বাধ্যবাধকতাবোধ আমার নিজ ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আমরা যখন কাউকে কোন কিছু করা উচিত বলে মনে করি তখন এই ঔচিত্যবোধকে সার্বজনীন বলে গ্রহণ করি। অর্থাৎ, একই অবস্থায় অন্যান্য সকলের জন্যও ঐ কাজটি সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। 'বিপদের সময় আমার সাহায্য করা উচিত'-এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে অনুরূপ অবস্থায় সকলেরই একইভাবে কাজ কারা উচিত বা কর্তব্য।

কাজেই বলা চলে কান্টের নৈতিক বিচারের সার্বজনীনত্বের দাবি হেয়ারকে বেশ প্রভাবান্বিত করে। হেয়ার নিজেও এ প্রভাবের কথা স্বীকার করে নেন। আসলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হেয়ারের সর্বজনীনকরণযোগ্যতার নীতি কান্টের নৈতিক বিচারের সার্বজনীনত্বের ধারণার খানিকটা পরিমার্জিত সংস্করণ।এই প্রসঙ্গে V.P Varma বলেছেন-"It can. therefore reasonably be held that his (Hare`s)thesis of universalizability is fundamentally the same as the Kantian formula"[17] হেয়ার বিভিন্ন ভাবে দেখাতে চেষ্টা করেন যে আমাদের বাধ্যবাধকতাবোধ নৈতিক বিচারের সর্বজনীনকরণযোগ্যতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তিনি তাঁর The Promising Games' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের বাধ্যবাধকতার সম্ভবানা সম্পর্কে বলেন যে, "যখনই আমরা কোন নীতিকে গ্রহণ করি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই তখনই আমাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতাবোধের উদ্ভব হয়"।[18] অনুসৃত নীতিটি পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ নীতি অনুসারে আমরা কাজ করতে বাধ্য। এই বিশেষ নীতির প্রতি আস্থা থেকেই ঐ বিশেষ বিষয়ে আমাদের বাধ্যবাধকতাবোধের সৃষ্টি হয়। হেয়ার এই বাধ্যবাধকতাবোধকে সঙ্গত কারণে সর্বজনীন বলেন। কান্টের নৈতিক মতবাদেও বাধ্যবাধকতাবোধ সর্বজনীনত্বের ধারণার আনুষঙ্গিক। কাজেই বলা যায় কান্টের নৈতিক নিয়মের সর্বজনীনত্বের ধারণার সাথে হেয়ারের নৈতিক বিচারের সর্বজনীনকরণযোগ্যতা নীতির অনেকটা সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে।

[17] Varma, V.P, some contemporary meta ethical theories, পৃ-১৯৯
[18] Foot, P, Theories of Ethics, পৃ-১১৫-১২৭

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Kant, Immanuel, (translate by Mary Gregor), (1785), *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, Cambridge University Press: 1997
2. Kant, Immanuel, (1785), *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, Cambridge University Press: 1998
3. Mackenzie, J.S, *A Manual of Ethics*, Longmans, Green, and Co: 1922
4. Hare, R.M, *The Language of Morals*, Oxford: 1952
5. Hare, R.M, *Freedom and Reason*, Landon: 1963
6. Varma, V.P, *Some contemporary Meta Ethical Theories*, Delhi: 1978
7. Warnock, G.J, *Contemporary Moral Philosophy*, Landon: 1967
8. Lillie, William, *An Introduction to Ethics*, Methuen & co. ltd. London:1957
9. Singer, Peter, *Practical Ethics*, Cambridge University Press: 2011
10. মুহিত, মোঃ আব্দুল, *ইমানুয়েল কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিদর্শন* , জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ: ২০২০
11. আবদুল হামিদ, ডঃ এম, *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা* , অনন্যা, ঢাকা: ২০১০
12. চক্রবর্তী , সোমনাথ , *নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা* , প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা: ১৯৯৮
13. গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিবিদ্যা ও ফলিত নীতিবিদ্যা*, প্রথম সংস্করণ, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা: ২০০২
14. ভদ্র, মৃণাল কান্তি, *নীতিবিদ্যা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান: ২০০২
15. ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র, *সাম্মানিক নীতিবিদ্যা*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা: ২০১৩